بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৯ জুলাই, ২০২১ মোতাবেক ০৯ ওফা, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত উমর (রা.)-এর স্মৃতিচারণ করা হচ্ছিল। 'কাযা বিভাগ' (তথা বিচার বিভাগ) প্রতিষ্ঠার বিষয়ে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, হযরত উমর (রা.) 'কাযা বিভাগ' খুলেছিলেন। সকল জেলায় নিয়মিত আদালত প্রতিষ্ঠা করেন এবং কাজী পদায়ন করেন। হযরত উমর (রা.) কাযা বা বিচারবিভাগ সম্পর্কে আইন সংক্রান্ত নির্দেশাবলী জারী করেন। কাজী নিয়োগের ক্ষেত্রে ফিকাহ্ বিশেষজ্ঞদের মনোনয়ন দেয়া হতো, কিন্তু হযরত উমর (রা.) এটিকেই যথেষ্ট মনে করতেন না, বরং রীতিমতো তাদের পরীক্ষা নিতেন। কাজীদের জন্য চড়া বেতন নির্ধারণ করতেন যেন কেউ অন্যায় সিদ্ধান্ত প্রদান না করে। সম্পদশালী এবং সম্মানিত ব্যক্তিদের কাজী মনোনয়ন দিতেন যেন সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষেত্রে তারা অন্য কারো প্রভাবে প্রভাবিত না হন। হযরত উমর (রা.) আদালতে সাম্য এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার উপদেশ দিতেন। একবার হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)-এর সাথে [হযরত উমর (রা.)-এর] কোন বিষয়ে বিবাদ দেখা দেয়। হযরত উবাই (রা.) হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.)-এর আদালতে মামলা করেন। হযরত যায়েদ (রা.) হযরত উমর (রা.) এবং উবাই (রা.)-কে উপস্থিত হতে বলেন আর (উপস্থিতির পর কাজী) হযরত উমর (রা.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, (হে যায়েদ!) এটি তোমার প্রথম অন্যায়– একথা বলে তিনি উবাই (রা.)-এর পাশ গিয়ে বসেন। অর্থাৎ আমরা দুটি বিবদমান পক্ষ এবং উভয় বিবদমান পক্ষকে সাম্যের চোখে দেখ আর পাশাপাশি বসাও, আমাকে এক্ষেত্রে অধিক সম্মান দিও না।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ ঘটনার উল্লেখ এভাবে করেছেন যে, একদা দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.)-এর সাথে উবাই বিন কা'ব (রা.)-এর [কোন বিষয়ে] দ্বন্দ্ব হয়। কাজীর কাছে মামলা দায়ের করা হয়। তিনি হযরত উমর (রা.)-কে আদালতে উপস্থিত হতে বলেন এবং তিনি (রা.) উপস্থিত হলে সম্মানার্থে তাঁর (রা.) জন্য নিজের চেয়ার ছেড়ে দেন একথা ভেবে যে, তিনি তো যুগ-খলীফা। কিন্তু হযরত উমর (রা.) প্রতিপক্ষের পাশে গিয়ে বসেন এবং কাজীকে সম্বোধন করে বলেন, এটি তোমার প্রথম অবিচার, যা তুমি করলে। এ মুহূর্তে আমার ও আমার প্রতিপক্ষের মাঝে কোন পার্থক্য করা সমীচীন নয়।

হযরত উমর (রা.) 'ইফতা বিভাগ'ও চালু করেন। শরীয়তের বিধান সম্বন্ধে জ্ঞাত করার জন্য 'ইফতা বিভাগ' চালু করেন এবং কয়েকজন সাহাবীর নাম ঘোষণা করেন যে, তারা ছাড়া অন্য কারো ফতোয়া গ্রহণ করা হবে না। এই ফতোয়াদাতাদের মাঝে ছিলেন যথাক্রমে হযরত আলী (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.), হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.), হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.), হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এবং হযরত আবু দারদা (রা.) প্রমুখ। তাঁরা ছাড়া অন্য কেউ ফতোয়া দিলে হযরত উমর (রা.) তাকে বারণ করতেন। হযরত উমর (রা.) এই মুফতিদেরও বিভিন্ন সময় পরীক্ষা নিতেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ বিষয়ে বলেন যে, ফতোয়া বিষয়ক একটি ঘটনা রয়েছে। মহানবী (সা.)-এর (তিরোধানের) পর খলীফাদের যুগে শরীয়তের বিষয়ে সবার

ফতোয়া দেয়ার অধিকার ছিল না। হযরত উমর (রা.) এ বিষয়ে এতটাই সাবধানতা অবলম্বন করতেন যে, এক সাহাবী, সম্ভবত হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাস'ঊদ (রা.), যিনি ধর্মীয় জ্ঞানে বেশ পারদর্শী ছিলেন এবং অনেক সম্মানিত মানুষ ছিলেন, একবার তিনি (রা.) (ফতোয়স্বরূপ) কোন মাসলা মানুষের সামনে উপস্থাপন করেন। হযরত উমর (রা.) এ বিষয়ে জানতে পেরে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে জবাবদিহি করেন যে, তুমি কি আমীর নাকি তোমাকে আমীর ফতোয়া দেয়ার জন্য মনোনীত করেছেন? মোটকথা যদি প্রত্যেক ব্যক্তি ফতোয়া দেয়ার অধিকার লাভ করে তাহলে বহু সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে এবং জনসাধারণের জন্য কতক ফতোয়া পরীক্ষার কারণ হতে পরে, কেননা কখনো কখনো একই বিষয়ের জন্য দু'টো ভিন্ন ভিন্ন ফতোয়া হয়ে থাকে এবং দু'টোই সঠিক হয়ে থাকে। অর্থাৎ ফতোয়া পরিবেশ-পরিস্থিতি সাপেক্ষে দেয়া হয়ে থাকে; বিষয়াবলী যদি গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় তবে তাতে ছাড়ের সুযোগ থাকে যে, অবস্থা এমন হলে ফতোয়া এটি হবে, অবস্থা যদি ভিন্ন হয় তবে ফতোয়াও ভিন্ন হবে। কিন্তু জনসাধারণের জন্য এটা বুঝা কঠিন হয়ে পড়ে যে, দু'টোই কীভাবে সঠিক হতে পারে? ফলে তারা পরীক্ষায় নিপতিত হয়।

একইভাবে পুলিশ বিভাগও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত উমর দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য 'আ'দাস' অর্থাৎ পুলিশ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিভাগকে তিনি জবাবদিহিতার সম্মুখীন করা, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, বাজারের তত্ত্বাবধান প্রভৃতির কর্তৃত্ব প্রদান করেছিলেন; অর্থাৎ জনগণের ওপর এই দৃষ্টি রাখা যে, সঠিকভাবে আইন মান্য করা হচ্ছে কি-না, যদি কারো অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয় তবে তাদের অধিকার পাইয়ে দেয়া, ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়গুলো কাজীর কাছে উত্থাপিত হওয়া পর্যন্ত তারা দেখাশুনা করতেন। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, বাজারের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি বিষয়ের তত্ত্বাবধানের কর্তৃত্ব তাদের ছিল। হযরত উমর নিয়মিত কারাগারও নির্মাণ করান, ইতিপূর্বে কারাগারের প্রচলন ছিল না; অপরাধীদের কঠোর শাস্তিও দেয়া হতো। অনুরূপভাবে বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠার বিষয়টিও রয়েছে। হযরত উমরের যুগের পূর্বে যে সম্পদই আসতো তা সাথে সাথে বিতরণ করে দেয়া হতো। হযরত আবু বকরের যুগে একটি বাড়ি কিনে বায়তুল মাল হিসেবে ওয়াক্ফ করা হয়েছিল, কিন্তু তা বন্ধই থাকতো। কারণ যে সম্পদই আসতো তা সাথে সাথেই বিতরণ করে দেয়া হতো। ১৫ (পঞ্চদশ) হিজরী সনে বাহরাইন থেকে পাঁচ লক্ষ পরিমাণ অর্থ এলে হযরত উমর সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন যে, এই অর্থ দিয়ে কী করা যায়। একটি অভিমত এরূপ ছিল যে, সিরিয়ান সাম্রাজ্যে কোষাগার বিভাগ রয়েছে; সুতরাং এই পরামর্শ হযরত উমর পছন্দ করেন এবং মদিনায় বায়তুল মালের ভিত্তি রাখেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আরকামকে কোষাগারের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে মদিনা ছাড়াও সকল প্রদেশ ও সেগুলোর রাজধানীতে বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। হযরত উমর স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে (সাধারণত) কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করতেন, কিন্তু বায়তুল মালের জন্য অত্যন্ত মজবুত ও সুরম্য ভবন নির্মাণ করাতেন। পরবর্তীতে সেগুলোর জন্য প্রহরীও নিয়োগ করা হয়েছিল; সেগুলোর পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বায়তুল মালের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ স্বয়ং হযরত উমর করতেন। ইতিহাসে একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত উসমান বিন আফফানের একজন মুক্ত কৃতদাস বর্ণনা করেন, একদিন প্রচণ্ড গরম পড়েছিল। আমি হযরত উসমানের সাথে 'আলিয়া' নামক স্থানে তার গবাদি পশুর কাছে ছিলাম। [**আলিয়া** হলো মদিনা থেকে **নাজ্দ**-এর দিকে চার থেকে আট মাইল দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত উপত্যকার নাম।] তিনি এক ব্যক্তিকে দেখতে পান যে দুটি (কমবয়স্ক) তাগড়া উটকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। [অর্থাৎ হযরত উসমান দেখতে পান, এক ব্যক্তি আসছে এবং দুটি তাগড়া উট তার সামনে সামনে চলছে।] আর মাটি ছিল খুবই উত্তপ্ত। এটি দেখে হযরত উসমান বলেন, এই লোকটার কী হয়েছে? যদি সে মদিনায় অবস্থান করত এবং আবহাওয়া

ঠাণ্ডা হওয়ার পর বের হতো, তবে তার জন্য ভালো হতো! [সেই কর্মচারী বলেন,] যখন সেই ব্যক্তি কাছে আসে তখন হযরত উসমান আমাকে বলেন, দেখ তো লোকটি কে! আমি বললাম, চাদর-মুড়ি দেয়া এক ব্যক্তি যে দুটি তাগড়া উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এরপর সেই ব্যক্তি যখন আরও কাছে আসে তখন হযরত উসমান পুনরায় বলেন, দেখ তো কে! আমি গিয়ে দেখতে পেলাম যে, তিনি হযরত উমর বিন খাত্তাব। আমি নিবেদন করলাম, ইনি তো আমীরুল মুমিনীন! হযরত উসমান উঠে দরজা দিয়ে মাথা বাইরে বের করেন, কিন্তু তীব্র গরম বাতাসের হলকা লাগায় তিনি মাথা ভেতরে ফিরিয়ে আনেন এবং সাথে সাথেই পুনরায় (মাথা বের করে) হযরত উমরকে লক্ষ্য করে বলেন, কীসে আপনাকে এখন ঘর থেকে বের হতে বাধ্য করল?' হযরত উমর বলেন, সদকার উটগুলোর মধ্য থেকে এই দু'টো উট পেছনে রয়ে গিয়েছিল, এই দু'টো ছাড়া অবশিষ্ট সব উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমার মনে হলো, এই দু'টোকে চারণভূমিতে নিয়ে যাওয়া উচিত। আমার শঙ্কা ছিল যে, এই দু'টো হারিয়ে যেতে পারে, পরে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সেগুলোর বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন। হযরত উসমান বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি ছায়ায় আসুন এবং পানি পান করুন, আমরাই আপনার জন্য যথেষ্ট। আমরা সেবা করব, পাঠানোর ব্যবস্থা করব। হযরত উমর বলেন, তোমার ছায়ায় তুমি ফিরে যাও আর সেখানে বসে থাক। হযরত উমরের মুক্ত কৃতদাস বলেন, আমি নিবেদন করলাম আমাদের কাছে যা আছে তা আপনার জন্য যথেষ্ট। উত্তরে হযরত উমর বলেন, তোমার ছায়ার দিকে ফিরে যাও। এরপর হযরত উমর চলে যান। হযরত উসমান বলেন, যে الْقَوِيُّ الْأَمِينُ। অর্থাৎ শক্তিশালী ও বিশ্বস্তকে দেখতে চায় সে এই ব্যক্তিকে দেখুক। অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, উমর বিন না'ফে আবু বকর ঈসার নিকট থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলতেন, আমি হযরত উমর বিন খাত্তাব, হযরত উসমান বিন আফ্ফান এবং হযরত আলী বিন আবু তালেবের সাথে সদকার সময় আসি। হযরত উসমান ছায়ায় বসে যান এবং হযরত আলী তার পাশে দাঁড়িয়ে ঐসব কথা তাকে বলেন যা হযরত উমর বলতেন। হযরত উমর তীব্র গরমের দিন হওয়া সত্ত্বেও রোদে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তাঁর কাছে দুটি কালো চাদর ছিল। একটি তিনি লুঙ্গিরূপে পরেছিলেন আরেকটি মাথায় রেখেছিলেন এবং সদকার উট পর্যবেক্ষণ করছিলেন ও উটের রং ও বয়স লিখে নিচ্ছিলেন। হযরত আলী হযরত উসমানকে বলেন, আল্লাহ্‌র কিতাবে তুমি হযরত শুয়ায়েবের কন্যার এ বাক্য শুনেছ যে, إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ অর্থাৎ, নিশ্চয় যাদেরকেই তুমি চাকর নিযুক্ত করবে তাদের মধ্যে সে-ই উত্তম প্রমাণিত হবে যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। অতঃপর হযরত আলী হযরত উমরের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, ইনি সেই الْقَوِيُّ الْأَمِينُ। (অর্থাৎ শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত) ব্যক্তি।

এ সম্পর্কিত ঘটনাটি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে বর্ণনা করেন, হযরত উমর এর একটি ঘটনা রয়েছে। হযরত উসমান বলেন, আমি একবার বাইরে তাঁবুতে বসে ছিলাম। এত তীব্র গরম পড়েছিল যে, দরজা খোলারও সাহস ছিল না। তখন আমার দাস আমাকে বলে, দেখ এই তীব্র গরমে বাইরে এক ব্যক্তি ঘোরাফেরা করছে। আমি পর্দা সরিয়ে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম যার চেহারা তীব্র গরমের কারণে ঝলসে গিয়েছিল। আমি তাকে বললাম, কোন মুসাফির হবে হয়ত। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ঐ ব্যক্তি আমার তাঁবুর কাছে আসে এবং আমি দেখি তিনি হলেন হযরত উমর (রা.)। তাকে দেখেই বিচলিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে বলি, এখন এই গরমে আপনি বাইরে কেন? হযরত উমর বলেন, বাইতুল মালের একটি উট হারিয়ে গিয়েছিল যার সন্ধানে আমি বাইরে ঘুরছি। এই উট হারিয়ে যাওয়ারও একটি ঘটনা রয়েছে যা পূর্বেও বর্ণনা করেছি।

হযরত উমর একবার বাইতুল মালের সম্পদ বণ্টন করছিলেন। তখন তার এক মেয়ে আসে এবং ঐ সম্পদ থেকে একটি দিরহাম উঠিয়ে নেয়। হযরত উমর তার কাছ থেকে সেটি

নেয়ার জন্য উঠেন। তাঁর এক কাঁধ থেকে চাদর পড়ে যায় আর সেই শিশু সন্তান কাঁদতে কাঁদতে গৃহে চলে যায় আর সেই দিরহামটি মুখে পুরে নেয়। হযরত উমর আঙুল ঢুকিয়ে তার মুখ থেকে সেই দিরহামটি বের করেন এবং সেটিকে যথাস্থানে রেখে দেন। অতঃপর তিনি বলেন, হে লোকসকল! উমর এবং তার বংশের জন্য, তারা দূরের হোক বা নিকটের, ততটুকুই অধিকার আছে যতটা সাধারণ মুসলমানদের আছে, এর অধিক নেই। আরেকটি বর্ণনা রয়েছে যে, হযরত আবু মূসা একবার বায়তুল মালে ঝাড়ু দিচ্ছিলেন। তখন তিনি একটি দিরহাম পান। হযরত উমরের এক শিশু সন্তান সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল। তখন তিনি তাকে সেটি দিয়ে দেন। হযরত উমর বাচ্চার হাতের সেই দিরহামটি দেখে ফেলেন। তিনি সেটি সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে এটি আমাকে আবু মূসা দিয়েছে। এটি বাইতুল মালের সম্পদ তা অবগত হওয়ার পর হযরত উমর বলেন, হে আবু মূসা! তোমার দৃষ্টিতে মদিনাবাসীদের মধ্যে উমরের পরিবারের চাইতে অধিক তুচ্ছ ঘর আর কোনটি ছিল না? তুমি কি চাও যে, উম্মতে মুহাম্মদিয়ার প্রত্যেক ব্যক্তি আমার কাছে সেই দিরহাম দাবি করুক! এরপর তিনি সেই দিরহাম বাইতুল মালে ফিরিয়ে দেন।

জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রা.) জনসাধারণের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য অনেক কাজ করেছেন। কৃষিখাতে উন্নতি এবং জনসাধারণের পানি সরবরাহের জন্য যেসব খাল তিনি খনন করিয়েছেন সেগুলোর নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

আবু মূসা খাল, যেটি দজলা নদী থেকে নয় মাইল দীর্ঘ খাল খনন করে বসরা পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়। মা'কাল খাল, এই খাল দজলা নদী থেকে বের করা হয়েছিল। আমীরুল মু'মিনীন খাল, হযরত উমর (রা.)-এর নির্দেশে নীল নদকে লোহিত সাগরের সাথে সংযুক্ত করা হয়। ১৮ হিজরী সনে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখন হযরত উমর (রা.) হযরত আমর বিন আস (রা.)-কে সাহায্যের জন্য চিঠি লিখেন। দূরত্ব বেশি থাকায় সাহায্য পৌঁছতে বিলম্ব হয়। হযরত উমর (রা.) হযরত আমরকে ডেকে বলেন, নীল নদকে সমুদ্রের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হলে আরবে কখনো দুর্ভিক্ষ হবে না। আমর সেখানকার গভর্ণর ছিলেন, তিনি ফিরে গিয়ে ফুসতাত থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত খাল খনন করান যার মাধ্যমে সামুদ্রিক জাহায মদিনার বন্দর জেদ্দা পর্যন্ত চলে আসতে পারতো। এই খাল ২৯ মাইল দীর্ঘ ছিল যা ছয় মাসে প্রস্তুত করা হয়েছিল। হযরত আমর বিন আস ভূমধ্যসাগর এবং লোহিত সাগরকে সংযুক্ত করার ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি ফরমার নিকট যেখানে লোহিত সাগর এবং ভূমধ্যসাগরের মাঝে ৭০ মাইলের দূরত্ব ছিল সেদিক দিয়ে খাল খনন করে উভয়টিকে সংযুক্ত করতে চেয়েছিলেন, ফরমা মিশরের একপ্রান্তে উপকূলবর্তী একটি শহর, কিন্তু হযরত উমর (রা.) গ্রীকদের হাতে হাজীরা লুটতরাজের শিকার হতে পারে– এই শঙ্কায় এই প্রস্তাবে সম্মত হন নি। হযরত আমর বিন আস যদি অনুমতি পেয়ে যেতেন তাহলে সুয়েজ খালের আবিষ্কারও আরবদের অর্জনের অংশ হতো যা পরবর্তীতে বানানো হয়েছিল।

বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ: হযরত উমর (রা.) জনগণের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বা জনকল্যাণে বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করিয়েছেন যেমন, মসজিদ, আদালত, সেনাছাউনি, ব্যারাক, রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো নির্মাণ সম্পর্কিত বিভিন্ন অফিস, সড়ক-মহাসড়ক, সেতু, অতিথিশালা, নিরাপত্তা চৌকি, হোটেল ইত্যাদি। মদিনা থেকে মক্কা পর্যন্ত প্রতি মঞ্জিলে (একদিনের যাত্রাপথ) বা যাত্রাবিরতিস্থলে (কৃত্রিম) ঝরনা ও সরাইখানা বানিয়েছেন। নিরাপত্তা চৌকিও নির্মাণ করিয়েছেন। অর্থাৎ নিরাপ্তারও যেন ব্যবস্থা থাকে আর মানুষের বিশ্রাম বা থাকার জন্য হোটেল প্রভৃতি ও পান্থশালা যেন সহজলভ্য হয়। নগরায়ণ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রা.) নিজ খিলাফতকালে অনেক নতুন শহর গড়ে তুলেছেন। তিনি এসব শহর আবাদ করার সময় প্রতিরক্ষা আর বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক বিষয়কে দৃষ্টিপটে রেখেছেন। এসব শহরের স্থান

নির্বাচন হযরত উমর (রা.)-এর রণকৌশল সংক্রান্ত দূরদর্শিতা ও ব্যবস্থাপনা এবং জনবসতি গড়ে তোলার বিষয়ে সূক্ষ্মদর্শিতার সাক্ষ্য বহন করে। এসব শহর যুগপৎ যুদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ অবস্থাতেও উপযোগী ছিল। হযরত উমর (রা.) অকস্মাৎ আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আরবের যে সীমান্ত অনারব অঞ্চলের সাথে সংযুক্ত সেসব অঞ্চলে জনবসতি বা শহর গড়ে তোলার চেষ্টা করতেন। এসব শহরের ভৌগোলিক অবস্থান আরবদের অনুকূলে থাকত বা আরবদের জন্য উপযুক্ত হতো। এসব শহরের একদিকে আরবের ভূমি, যা চারণভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হতো আর অপর দিকে অনারবদের সবুজ-শ্যামল অঞ্চল হতো, যেখানে শস্য, ফল-ফলাদি এবং অন্যান্য জিনিস পাওয়া যেত, অর্থাৎ কৃষিকাজ অপরদিকে করা হতো। এসব শহর আবাদের ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে যেন উভয় অঞ্চলের মাঝে কোন নদী বা সমুদ্র প্রতিবন্ধক না থাকে। হযরত উমর (রা.) বসরা, কুফা, ফুসতাত প্রভৃতি শহর আবাদ করেছেন। হযরত উমর সুদৃঢ় ও সঠিক ভিত্তিতে এসব শহর আবাদ করেছেন। এসব শহরের সড়ক ও রাস্তাগুলোকে প্রশস্ত রেখেছেন, উন্মুক্ত ও প্রশস্ত সড়ক ছিল আর সবকিছু খুবই চমৎকারভাবে সুবিন্যস্ত করেছেন, এসব সুচিন্তিত পদক্ষেপ প্রমাণ করে যে, তিনি এই জ্ঞানে পারদর্শী এবং অনন্য ছিলেন।

একইভাবে তিনি সেনা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করেছেন। হযরত উমর (রা.) রীতিমত সেনাবাহিনীকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল করেছেন। মর্যাদা ও পদ অনুসারে সেনাবাহিনীর রেজিস্টার প্রস্তুত করিয়েছেন এবং তাদের বেতন নির্ধারণ করেছেন। হযরত উমর (রা.) সৈন্যদের দু'টি দলে বিভক্ত করেছেন। একদল, যারা নিয়মিত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন আর অপর দলটি ছিল সেচ্ছাসেবকদের, যাদের প্রয়োজনের সময় ডাকা হতো। সৈন্যদের প্রশিক্ষণের প্রতি হযরত উমর (রা.)-এর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি জোরালো নির্দেশনা জারী করেছিলেন যে, বিজিত দেশসমূহে কেউ যেন চাষাবাদ বা ব্যবসায়িক কোন কাজ না করে। সেনাদের জন্য নির্দেশনা ছিল যে, বিজিত অঞ্চলে কোন ব্যক্তি ব্যবসাবাণিজ্য অথবা চাষাবাদ করবে না, কেননা এর ফলে সৈন্যদের সেনাসুলভ নৈপুণ্যের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। বর্তমান যুগে আমরা মুসলমান রাষ্ট্রসমূহেও দেখি, সৈন্যরা বিভিন্ন ব্যাবসাবাণিজ্যে ব্যস্ত থাকে। বরং কোন এক দেশ সম্পর্কে বলা হয় যে, পূর্বে সৈন্যদের পেশাদারিত্বের যোগ্যতা দেখা হতো এখন কমিশন পেলেই অফিসার দেখে যে, কোথায় নতুন কলোনি তৈরি হচ্ছে, কোথায় নতুন ডিফেন্স কলোনি তৈরি হচ্ছে যেখানে আমি প্লট পাব আর প্লট বরাদ্দ করব। যাহোক, এ কারণেই তাদের সৈনিকসুলভ দক্ষতা হ্রাস পাচ্ছে বা কমে যাচ্ছে। এরপর গরম এবং শীতপ্রধান দেশসমূহে আক্রমণের সময় আবহাওয়ার প্রতিও দৃষ্টি রাখা হয় যাতে সৈন্যদের স্বাস্থ্যের কোন প্রকার ক্ষতি না হয়। সৈন্যদের সম্পর্কে হযরত উমর (রা.) কঠোরভাবে এই দিকনির্দেশনা প্রদান করেছিলেন যে, সকল সৈন্য যেন সাঁতার, তিরন্দাজি এবং খালি পায়ে হাঁটা শিখে। চার মাস অন্তর অন্তর সৈন্যদের নিজ দেশে গিয়ে নিজ পরিবারবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য ছুটি দেওয়া হতো। কষ্ট সহিষ্ণুতার নিমিত্তে এই নির্দেশনা ছিল যে, সৈন্যরা রিকাবের সাহায্যে বাহনে আরোহন করবে না। অর্থাৎ ঘোড়ায় আরোহনের জন্য রিকাবে পা দিয়ে ঘোড়ায় উঠা যাবে না, বরং লাফ দিয়ে উঠতে হবে। নরম মোলায়েম কাপড় পরবে না, রোদ এড়িয়ে চলবে আর হাম্মামে গোসল করবে না, কেননা এতে আরামপ্রিয়তার অভ্যাস হতে পারে। হযরত উমর (রা.) বসন্তকালে সৈন্যদের সবুজশ্যামল অঞ্চলে প্রেরণ করতেন। সেনা ব্যারাক এবং সেনাছাউনি বানানোর সময় আবহাওয়ার বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা হতো। সৈন্যদের সবুজে ঘেরা অঞ্চলে প্রেরণ করা আবশ্যক ছিল যাতে সেখানকার স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় তাদের শরীর-সাস্থ্যও ভালো থাকে। যাহোক, আবহাওয়াকে দৃষ্টিপটে রাখা হতো। সকল জেলাতে সেনানিবাস বানিয়েছেন। সেনাকেন্দ্র হিসাবে মদিনা, কূফা, বসরা, মসুল, ফুসতাত, দামেস্ক,

হিমস, জর্ডান, ফিলিস্তিনকে নির্ধারণ করা হয়, যেখানে সবসময় সৈন্য মোতায়েন থাকত। চার মাস অন্তর সৈন্যদের ছুটি দেওয়া হতো। সেনাকেন্দ্রে সব সময় চার হাজার ঘোড়া থাকত যেগুলোর দেখাশুনা করা হতো। ঘোড়ার রানে "জায়শুন ফী সাবীলিল্লাহ্" অর্থাৎ 'আল্লাহর লস্কর' লিখা থাকত। হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে মুসলমান সৈন্যরা যুদ্ধাস্ত্রে অনেক উন্নতি করেছে, নতুন নতুন সরঞ্জামাদি সংযোজন করা হয়েছে, যার মধ্যে দুর্গভেদী কামান, মানজানিক এবং দাবাবা ছিল। দাবাবা হচ্ছে সেই অস্ত্র যেটি দিয়ে শত্রুর দুর্গ ভাঙা এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হতো। এর মধ্যে বসে দুর্গের প্রাচীরসমূহে ফাটল তৈরি করে প্রাচীর গুড়িয়ে দেয়া হতো।

ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে বিজাতি লোকেরা বড় বড় পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। শুধুমাত্র মুসলমানদেরই বড় বড় পদ দেওয়া হতো না, বরং অমুসলিম এবং ভিন জাতিগোষ্ঠীর লোকদেরও বড় বড় পদ দেওয়া হতো। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.)-এর খলীফাদের যুগেও, যখনকিনা দেশে পূর্ণ নিরপত্তার সাথে জাতিসমূহ বসবাস আরম্ভ করেনি, তখনও এসব অধিকারের স্বীকৃতি ছিল। আল্লামা শিবলী এর উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, হযরত উমর (রা.) যুদ্ধ অধিদপ্তরকে যে বিস্তৃতি দিয়েছিলেন সেক্ষেত্রে দেশ ও জাতির কোন ভেদাভেদ ছিল না, এমনকি জাতি ও ধর্মেরও কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। সেচ্ছাসেবক বাহিনীতে তো হাজার হাজার অগ্নিপূজারী অন্তর্ভুক্ত ছিল, অর্থাৎ এমন লোক যারা খোদাকে মানে না, বরং আগ্নি-উপাসক ছিল, সূর্যের উপাসনাকারীরাও এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল, তারা মুসলমান সৈনিকদের সমপরিমাণ বেতন-ভাতা পেতো। সামরিক ব্যবস্থাপনায় অগ্নিউপাসকদের অন্তর্ভুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে তিনি লিখেন, গ্রীক ও রোমান সাহসী ব্যক্তিরাও সেনাবাহিনীতে ছিল। যেমন মিশর বিজয়ের সময় তাদের পাঁচশত ব্যক্তি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। অথচ আজ পাকিস্তানে বলা হয় যে, আহমদীদেরকে সেনাবাহিনী থেকে বের করে দাও, কেননা এগুলো খুবই স্পর্শকাতর পোষ্ট। অথচ ইতিহাস পাঠে জানা যায়, পাকিস্তানের জন্য আহমদী অফিসাররাই সবচেয়ে বেশি ত্যাগস্বীকার করেছে। যাহোক এটি তো তাদের নিজস্ব কাজ।

হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, আমর বিন আস যখন ফুসাতাত আবাদ করেন তখন এই বিচ্ছিন্ন স্থানকেও মহল্লারূপে আবাদ করেন। ইহুদিদেরকেও এসব পাড়ায় আবাদ করা হয়। মিশর বিজয়ের সময় তাদের মধ্য হতে এক হাজার লোক ইসলামী সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিল। তদ্রূপ, ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, ভিন জাতি-গোষ্ঠীর লোকদেরকে সেনাকর্মকর্তা নিযুক্ত করা হতো। এছাড়া হযরত উমর (রা.)-এর যুগে ইরানীদেরকেও সেনাকর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছে। তাদের কতকের নামও ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে। আল্লামা শিবলী ছয়জন অফিসারের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন। তারা হলেন: সিয়াহ্, খসরু, শাহরিয়ার, শিরভিয়াহ্, শেহেরভিয়াহ্, আফরোদীন। এই অফিসারদের বেতন-ভাতাও সরকারী কোষাগার থেকে প্রদান করা হতো এবং রীতিমত বেতন স্কেলেও তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইতিহাস থেকে সাব্যস্ত হয় যে, খুলাফায়ে রাশেদা বা চার খলীফার পর হযরত মুয়াবিয়ার সময়ে ইবনে আসাল নামের এক খ্রিষ্টান কোষাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিল। এর ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে যে, তফসীরে কবীরে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) আল্লামা শিবলীর বরাতে আফরোদীন লিখেছেন। আল-ফারুকেও একইরকম লিখা হয়েছে। কিন্তু আরবী গ্রন্থসমূহে আফরোযীন লিখা হয়েছে, অর্থাৎ 'দাল' এর পরিবর্তে 'যাল' লিখা হয়েছে। যাহোক, সামান্য নামের পার্থক্যের কথা উল্লেখ করলাম এজন্য যে, লোকজন এ বিষয় নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে।

অনুরূপভাবে, বাজার নিয়ন্ত্রণ ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ-এর ক্ষেত্রে অবৈধভাবে মূল্যপতনকেও ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে আর হযরত উমর (রা.) এই আইন মানিয়েছেন। এ সম্পর্কে অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য কমানোর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

ইসলাম অবৈধপন্থায় পণ্যের মূল্যপতন করতেও নিষেধ করেছে। মূল্যপতনও অবৈধ অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হয়ে থাকে। কেননা এই পন্থায় শক্তিশালী বা বড় ব্যবসায়ীরা ছোট ব্যবসায়ীদেরকে স্বল্পমূল্যে পণ্য বিক্রয় করতে বাধ্য করে আর এভাবে তাদেরকে দেউলিয়া করে দিতে পারে। হযরত উমর (রা.)-এর যুগের একটি ঘটনা, একবার তিনি (রা.) বাজার পরিদর্শন করছিলেন। এমন সময় বাহির হতে আগত এক ব্যক্তিকে দেখেন যে, সে শুকনো আঙ্গুর অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করছে, যে মূল্যে বিক্রয় করা মদিনার ব্যবসায়ীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি (রা.) তাকে নির্দেশ দেন যে, হয় তোমার পণ্য বাজার থেকে তুলে নিয়ে যাও নতুবা সেই মূল্যেই পণ্য বিক্রয় কর যে মূল্যে মদিনার ব্যবসায়ীরা বিক্রয় করছে। মদিনার ব্যবসায়ীরা পণ্যের অধিক মূল্য নিচ্ছিল না, বরং তাদের ব্যায়ের নিরিখে ন্যায্য মূল্যই নিচ্ছিল। তিনি (রা.) বলেন, এই মূল্যেই বিক্রয় কর। তাঁকে এই নির্দেশের কারণ জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, সেই ব্যক্তিকে যদি এভাবে পণ্য বিক্রয়ের অনুমতি দেয়া হয় তাহলে মদিনার ব্যবসায়ীরা, যারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয় করছে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই, কতিপয় সাহাবী হযরত উমর (রা.)-এর এই কাজের বিপরীতে মহানবী (সা.)-এর এই উক্তিও উপস্থাপন করেছিল যে, বাজারমূল্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, কিন্তু তাদের এই আপত্তি সঠিক ছিল না, কেননা বাজারমূল্যে হস্তক্ষেপ করার অর্থ হচ্ছে উৎপাদন এবং চাহিদার নীতিতে হস্তক্ষেপ না করা, অর্থাৎ সরবরাহ ও চাহিদার নীতিতে হস্তক্ষেপ করার কথা বলা হয়েছে। আর এমনটি করা নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর সাব্যস্ত হয় এবং এমন করা থেকে সরকারের বিরত থাকা উচিত। চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে বাজার নিজেই নিজের সমন্বয় করে নেয়। অন্যথায় যদি [বাজারকে চাহিদা ও যোগান নিয়ন্ত্রণের] অনুমতি দেয়া না হয়, তাহলে জনসাধারণের কোন উপকার হবে না এবং ব্যবসায়িরা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি বৈধ।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরেক স্থানে এর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে তুলে ধরেছেন যে, নাগরিক অধিকারের মাঝে এটিও অন্তর্ভুক্ত যেন আদান-প্রদানের [বা ক্রয়-বিক্রয়ের] বিষয়ে অসঙ্গতি না থাকে। আমরা দেখতে পাই, ইসলাম এ অধিকারও উপেক্ষা করে নি। বস্তুত ইসলাম দর বৃদ্ধি করতে এবং চড়া দরে ক্রয়-বিক্রয় করতে বারণ করেছে। অনুরূপভাবে অন্যের লোকসান করাতে এবং তাদের ব্যবসা লাটে উঠানোর জন্য দরপতন ঘটাতেও নিষেধ করেছে। প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে মূল্য কমিয়ে দেয়াও নিষিদ্ধ। একবার মদিনায় এক ব্যক্তি এমন মূল্যে আঙ্গুর বিক্রি করছিল, যে মূল্যে অন্য দোকানিদের পক্ষে বিক্রি করা সম্ভব ছিল না। হযরত উমর (রা.) তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেই ব্যক্তিকে তিরস্কার করেন, কেননা এভাবে অন্য দোকানিদের লোকসান হচ্ছিল। মোটকথা ইসলাম মূল্য বৃদ্ধি করতেও বারণ করেছে এবং দরপতন ঘটাতেও নিষেধ করেছে, যেন দোকানিদেরও লোকসান না হয়, কিংবা জনসাধারণেরও ক্ষতি না হয়।

শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রা.) শিক্ষা-ব্যবস্থার অত্যন্ত উন্নতি সাধন করেন। তিনি সারাদেশে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে পবিত্র কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ্ বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হতো। বড় বড় আলেম সাহাবীদের শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয় এবং শিক্ষকদের বেতন-ভাতাও নির্ধারণ করা হয়।

অনুরূপভাবে হিজরী ক্যালেন্ডারের সূচনা সম্পর্কে হাদীসে বিভিন্ন রেওয়ায়েতে রয়েছে। এগুলোর একটি সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েত; হযরত সাহল বিন সা'দ (রা.) বর্ণনা করেন যে, সাহাবীরা মহানবী (সা.)-এর নবুওয়্যত-প্রাপ্তির সময় থেকে তারিখ গণনা করেন নি, কিংবা

তাঁর মৃত্যুর সময় থেকেও না; বরং তাঁর মদিনায় আগমনের সময় থেকে তারা তারিখ গণনা করেছেন। অর্থাৎ হিজরতের সময় থেকে (তারিখ গণনা শুরু করেন)। বুখারী শরীফের শারেহ্ (ভাষ্যকার) আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী বলেন, ইমাম সুহায়লীর মতে সাহাবীরা হিজরতের সময় থেকে তারিখ গণনা শুরু করার ধারণা আল্লাহ্ তা'লার বাণী لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ – আয়াত থেকে নিয়েছেন। অতএব مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ – এর অর্থ সেই দিনটি, যেদিন মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা মদিনায় পদার্পণ করেন। আল্লাহ্ই ভালো জানেন প্রকৃত সত্য কী।

হিজরি ক্যালেন্ডারের প্রয়োজনীয়তা কেন দেখা দিল– এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। হযরত আবু মূসা (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে লিখেন, আপনার পক্ষ থেকে আমাদের কাছে তারিখবিহীন চিঠিপত্র এসে থাকে। এ প্রেক্ষিতে হযরত উমর (রা.) মানুষকে পরামর্শের জন্য একত্র করেন। আল্লামা ইবনে হাজর বলেন, ইমাম বুখারী কিতাবুল আদব-এ এবং ইমাম হাকেম, মায়মুন বিন মেহরানের বরাতে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রা.)-এর সমীপে একটি চেক উপস্থাপন করা হয় যার মেয়াদ ছিল শাবান মাস পর্যন্ত। তিনি (রা.) বলেন, এটি কোন শাবান? এটি কি সেই (শাবান) যা অতিবাহিত হয়ে গেছে, অথবা যা আমরা অতিবাহিত করছি নাকি সেই শাবান যা আগামীতে আসবে? তিনি (রা.) বলেন, মানুষের জন্য কোন তারিখ নির্ধারণ কর যা সবার জানা থাকবে।

ইবনে সীরিন বলেন, এক ব্যক্তি ইয়েমেন থেকে এসে বলে, আমি ইয়েমেনে একটি বিষয় দেখেছি যাকে তারা তারিখ বলে; তারা এটি এভাবে লিখে– অমুক সন এবং অমুক মাস। হযরত উমর (রা.) বলেন, এটি খুবই ভালো পন্থা, তোমরাও তারিখ লিখ।

হিজরী পঞ্জিকার সূচনা কে করেন সে সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। প্রথম বক্তব্য অনুসারে মহানবী (সা.) তারিখ নির্দিষ্ট করার নির্দেশ দেন আর রবিউল আউয়াল মাসে তারিখ লিখা হয়। ইমাম হাকেম তার পুস্তক 'আল ইকলীল'-এ ইবনে শিহাব যুহরীর বরাতে বর্ণনা করেছেন, عن النبى صلى الله عليه و سلم لما قدم المدينة امر بالتاريخ فكتب في الربيع الاول। অর্থাৎ, মহানবী (সা.) যখন মদিনায় আসেন তখন তিনি (সা.) তারিখ লেখার নির্দেশ দেন, অতএব এটি রবিউল আউয়াল মাসে লিখা হয়েছে। আল্লামা ইবনে হাজর বলেন, এই হাদীসটি **'মু'আযযাল'**। মু'আযযাল সেই হাদীসকে বলা হয় যার বর্ণনার ক্রমধারায় পর পর দুই বা ততোধিক বর্ণনাকারী অগ্রহণযোগ্য থাকে। অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তারিখ লেখার সূচনা সেই দিন থেকে হয়েছে যেদিন মহানবী (সা.) হিজরত করে মদিনায় আগমন করেছিলেন। কিন্তু অধিক প্রচলিত ধারণা এর থেকে ভিন্ন; আর তা হলো, হিজরী পঞ্জিকার সূচনা হয় হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে।

'সুবুলুল হুদা ওয়ার্ রাশাদ ফি সীরাতি খায়রিল ইবাদ'–এর প্রণেতা মুহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী সাহেব বলেন, ইবনে সালাহ্ বলেছেন, তিনি আবু তাহের মাহ্মাশ প্রণীত পুস্তক **আশ্-শুহূদ'**-এ এটি লিখিত দেখেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তারিখ লেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কেননা তিনি (সা.) যখন নাজরানের খ্রিষ্টানদের উদ্দেশ্যে পত্র লিখার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন হযরত আলীকে বলেছিলেন, এতে লিখ– **'লে-খামসি মিনাল হিজরাতে'** অর্থাৎ হিজরতের অব্যবহিত পাঁচ বছর পর। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে (ইসলামী) তারিখের প্রথম প্রবর্তক হলেন রসূলুল্লাহ্ (সা.), আর হযরত উমর (রা.) এক্ষেত্রে তাঁর অনুকরণ করেছেন। অপর একটি ভাষ্য অনুসারে ইয়েমেনের অধিবাসী হযরত ইয়া'লা বিন উমাইয়া (ইসলামী) তারিখ লেখা আরম্ভ করেন। এটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ, কিন্তু এতে আমর এবং ইয়া'লার মাঝে **'ইনকেতা'** (অর্থাৎ বর্ণনাকারীর ক্রমধারা ছিন্ন) হয়েছে। তৃতীয় ও প্রসিদ্ধ অভিমত হলো, হিজরী পঞ্জিকার সূচনা হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে হয়েছিল। হিজরী পঞ্জিকার সূচনা

কেন হিজরত থেকে করা হয়– এ সম্পর্কে এই বর্ণনা পাওয়া যায় যে, হযরত উমর (রা.) যখন সাল নির্ধারণের বিষয়ে পরামর্শ আহ্বান করেন তখন একটি পরামর্শ ছিল, মহানবী (সা.)-এর জন্মের সাল থেকেই এর সূচনা করা হোক। দ্বিতীয় মত ছিল, তাঁর (সা.) নবুওয়্যতপ্রাপ্তির বছর থেকে এর সূচনা করা হোক। তৃতীয় মত ছিল, তাঁর (সা.) মৃত্যুর বছর থেকে এটি আরম্ভ করা হোক; আর চতুর্থ মতটি ছিল, তাঁর (সা.) হিজরতের বছর থেকে এর সূচনা করা হোক। হিজরতের বছর থেকেই এর সূচনা করাকে সংগত মনে করা হয়, কেননা জন্ম ও নবুওয়্যত লাভের বছর সম্পর্কে মতভেদ ছিল। তিরোধানের বছরকে এতদুদ্দেশ্যে নির্বাচন না করার কারণ হলো মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের কারণে মুসলমানদের দুঃখ বেদনার দিকটি তাতে অন্তর্নিহিত ছিল। অতএব সাহাবীরা হিজরতের বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন। সাহাবীরা রবিউল আউয়ালের পরিবর্তে মুহাররম মাস দিয়ে বছরের সূচনা কেন করেছিলেন? এর কারণ হলো, রসূলুল্লাহ্ (সা.) মুহাররম মাসেই হিজরতের ব্যাপারে মনস্থির করে নিয়েছিলেন। যিলহজ্জ মাসে আকাবার দ্বিতীয় বয়আত হয়ে গিয়েছিল আর সেটিই ছিল হিজরতের গোড়াপত্তন। এভাবে আকাবার দ্বিতীয় বয়আত ও হিজরতের দৃঢ় সংকল্প করার পর যে মাসের চাঁদ উদিত হয় তা ছিল মুহাররম মাসের চাঁদ। এজন্য এটিকেই সূচনাক্ষণ নির্ধারণ করাকে সংগত মনে করা হয়। আল্লামা ইবনে হাজর বলেন, ইসলামী পঞ্জিকার সূচনা মুহাররম মাস দ্বারা আরম্ভ হওয়ার ক্ষেত্রে আমার নিকট এটিই সবচেয়ে শক্তিশালী দলীল।

মহানবী (সা.) মদিনায় কবে আগমন করেন– এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তিনি (সা.) বিভিন্ন স্থানে যাত্রা বিরতি দিয়ে (অবশেষে) ১২ই রবিউল আউয়াল ১৪ নববী মোতাবেক ২০ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনার নিকটে পৌঁছেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এটি ছিল ৮ রবিউল আউয়াল। কারো কারো মতে তিনি (সা.) সফর মাসে বের হন এবং রবিউল আউয়াল মাসে পৌঁছেন। ১লা রবিউল আউয়াল তিনি (সা.) মক্কা থেকে হিজরত শুরু করেন আর ১২ রবিউল আউয়াল মদিনায় পৌঁছেন।

হিজরী সনের প্রবর্তন কোন বছর হয়েছিল, অর্থাৎ এই পঞ্জিকা কখন থেকে শুরু হয়েছিল– এ সম্পর্কেও বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কিছু লোক বলে এটি ১৬ হিজরী সনে হয়েছিল, কারো কারো মতে ১৭ হিজরী সন থেকে শুরু হয়, কেউ কেউ বলে ১৮ হিজরীতে হয়, আবার কারো কারে মতে ২১ হিজরীতে শুরু হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশই এ বিষয়ে একমত যে, হযরত উমর (রা.)-এর যুগেই এই পঞ্জিকার প্রবর্তন হয়েছিল।

ইসলামী মুদ্রা। সাধারণ ঐতিহাসিকদের মতে আরবে সর্বপ্রথম মুদ্রা চালু করেন আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান। পবিত্র মদিনার কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, সর্বপ্রথম ইসলামী মুদ্রা হযরত উমর (রা.)-এর যুগে চালু হয়েছিল। সেগুলোর ওপর 'আলহামদুলিল্লাহ্' খোদাই করা ছিল এবং কোন কোনটির উপর 'মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্' এবং কতকের উপর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু'-ও খোদিত থাকত। কিন্তু সাসানী, অর্থাৎ ইরানী রাজাবাদশাহদের ছবির বিষয়ে কোন বিতর্ক করা হয় নি। এক গবেষণা অনুসারে সর্বপ্রথম ইসলামী মুদ্রা ১৭ হিজরী সনে দামেস্কে হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু সেগুলোর ওপরও বাইজেন্টাইন সম্রাটদের ছবি আর লাতিন ভাষায় তাদের লেখা লিপিবদ্ধ থাকত। আরেকটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে ২৮ হিজরী সনে সর্বপ্রথম নিজেদের মুদ্রা ব্যবহৃত হয়েছে। সাময়িকভাবে সাসানীদের অঞ্চলে প্রচলিত মুদ্রাই ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলোর উপর সাসানী বাদশাহদের ছবি থাকত। কিন্তু সেগুলোর ওপর কুফার লিখন পদ্ধতিতে বিসমিল্লাহ্ লিখে দেয়া হয়েছিল।

পরের বিষয় হলো হযরত উমর (রা.) কী কী বিষয়ের সূচনা করেন। কোন কোন জিনিসকে আউয়ালিয়াতে ফারুকী বলা হয়। আল্লামা শিবলী নোমানী তাঁর পুস্তক 'আল

ফারুক'– এ লিখেছেন যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে হযরত উমর (রা.) যেসব নতুন বিষয়ের সূচনা করেছেন সেগুলোকে ঐতিহাসিকরা একত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন আর সেগুলোকে আউয়ালিয়াত বলা হয় এবং সেগুলো নিম্নরূপ– অর্থাৎ, তিনি এগুলোর সূচনা করান।

(১.) বায়তুল মাল তথা অর্থ-ভণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেন। ২. আদালত প্রতিষ্ঠা করেন এবং কাজী বা বিচারক নিযুক্ত করেন। ৩. তারিখ ও সনের (হিসাব) প্রতিষ্ঠা করেন, যা আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। ৪. হযরত উমর যুগ-খলীফার জন্য 'আমীরুল মু'মিনীন' উপাধি অবলম্বন করেন। ৫. সেনা-অধিদপ্তরের সূচনা করেন। ৬. স্বেচ্ছাসেবীদের বেতন নির্ধারণ করেন। ৭. অর্থ-দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন। ৮. পরিমাপ ব্যবস্থা চালু করেন। ৯. আদমশুমারি করান। ১০. খাল খনন করান। ১১. শহর গড়ে তুলেন, অর্থাৎ কুফা, বসরা, জিযা, ফুসতাত, মুসাল প্রভৃতি। ১২. অধিকৃত দেশগুলোকে প্রদেশে বিভক্ত করেন। ১৩. ওশুর, অর্থাৎ এক দশমাংশ কর বা শুল্ক নির্ধারণ করেন। ওশুর হযরত উমর (রা.)-এর আবিষ্কার, যার সূচনা এভাবে হয় যে, যেসব মুসলমান ভিন দেশে ব্যবসার উদ্দেশ্যে যেতেন সেখানে তাদের কাছ থেকে সেখানকার রীতি অনুযায়ী ব্যবসায়িক সম্পদের ওপর এক দশমাংশ শুল্ক নেয়া হতো। হযরত আবু মূসা (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে এ বিষয়ে অবগত করেন। তখন হযরত উমর (রা.) নির্দেশ জারি করেন যে, সেসব দেশের ব্যবসায়ীরা আমাদের দেশে এলে তাদের কাছ থেকেও সমপরিমাণ শুল্ক নেয়া হোক, অর্থাৎ তাদের কাছ থেকেও এক-দশমাংশ আদায় করা হোক। ১৪. নদীর পানি হতে সেচের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের ওপর কর ধার্য করেন এবং শুল্ককর্মকর্তা নিযুক্ত করেন। ১৫. যুদ্ধাস্ত্র ব্যবসায়ীদের দেশে আসার এবং ব্যবসা করার অনুমতি দেন। ১৬. জেলখানা স্থাপন করেন। ১৭. চাবুক (মারার আইন) প্রয়োগ করেন। ১৮. রাতে টহল দিয়ে প্রজাদের খোজখবর নেয়ার পন্থা উদ্ভাবন করেন। ১৯. পুলিশ বিভাগ চালু করেন। ২০. বিভিন্ন স্থানে সেনাছাউনি স্থাপন করেন। ২১. ঘোড়ার জাতে আসীল ও মুজান্নাসের পার্থক্য নির্ণয় করান, যা তখন পর্যন্ত আরবে (প্রচলিত) ছিল না। ২২. সাংবাদিক নিযুক্ত করেন। ২৩. মক্কা থেকে মদিনার পথে মুসাফিরদের বিশ্রামের জন্য সরাইখানা নির্মাণ করান। ২৪. অনাথ শিশুদের প্রতিপালনের জন্য প্রাত্যহিক ভাতা নির্ধারণ করেন। ২৫. বিভিন্ন শহরে অতিথিশালা নির্মাণ করান। ২৬. আরববাসীরা কাফের হলেও তাদেরকে দাস বানানো যাবে না– এই নিয়ম চালু করেন। ২৭. দরিদ্র খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের জন্য দৈনিক ভাতা নির্ধারণ করেন। ২৮. বিভিন্ন পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন। ২৯. শিক্ষক ও পাঠদানকারীদের মাসিক বেতন নির্ধারণ করেন। ৩০. হযরত আবু বকর (রা.)-কে জোর দিয়ে পবিত্র কুরআন সুবিন্যস্ত করতে সম্মত করেন এবং নিজ তত্ত্বাবধানে এই কাজ সম্পন্ন করেন। ৩১. পরিমাপের নীতি নির্ধারণ করেন। ৩২. অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের ক্ষেত্রে অউল-এর প্রথা প্রচলন করেন, অর্থাৎ ভরণপোষণের জন্য কোন কোন ব্যক্তিকে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করা। ৩৩. বাজামা'ত তারাবির নামাযের প্রচলন করেন। ৩৪. তিন তালাককে, যা একত্রে প্রদান করা হতো, তিনি 'তালাক-এ-বায়েন' আখ্যায়িত করেন, এটি তিনি শাস্তিস্বরূপ করেছিলেন। ৩৫. মদপানের ইসলামী শাস্তি হিসেবে আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেন। ৩৬. ব্যানিজ্যিক ঘোড়ার জন্য যাকাত নির্ধারণ করেন। ৩৭. বনু সালেব গোত্রের খ্রিষ্টানদের ওপর জিযিয়া করের পরিবর্তে যাকাত নির্ধারণ করেন। ৩৮. ওয়াকফ তথা জীবন উৎসর্গের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। ৩৯. জানাযার নামাযে চার তাকবীরে সবাইকে ঐকমত্য করান। এমনিতে সাধারণ রীতি এটিই যে, তিন তাকবীর হয়ে থাকে। অথবা প্রথম তাকবীরসহ শেষ তাকবীর পর্যন্ত, অর্থাৎ সালাম ফিরানোর পূর্ব পর্যন্ত চারটি তকবীর হয়ে থাকে। এখনও এটিই প্রচলিত আছে। ৪০. মসজিদসমূহে ওয়াজ এর পদ্ধতি প্রচলন করেন। আর তাঁর অনুমতিতে তামীম দারি ওয়াজ করেন, যা ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ওয়াজ। ৪১. ইমাম এবং মুয়াজ্জিনদের বেতনভাতা নির্ধারণ করেন। ৪২. মসজিদ সমূহে

রাতে আলোর ব্যবস্থা করেন। ৪৩. ব্যঙ্গ করার শরীয়তসম্মত শাস্তি নির্ধারণ করেন। ৪৪. কবিতায় মহিলাদের নাম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন, অথচ এই রীতি দীর্ঘকাল থেকে আরবে প্রচলিত ছিল। আল্লামা শিবলী লিখেন, এছাড়াও হযরত উমরের আরো অনেক অবদান রয়েছে যেগুলোকে আমরা কথা দীর্ঘায়িত হওয়ার ভয়ে লিপিবদ্ধ করছি না।

যাহোক এই স্মৃতিচারণ এখনও অব্যাহত আছে। আগামীতেও ইনশাআল্লাহ্ এধারা অব্যাহত থাকবে। এখন আমি কতিপয় প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করতে চাই। আর এরপর অর্থাৎ নামাযের পর (তাদের গায়েবানা) জানাযার নামাযও পড়াব।

প্রথম স্মৃতিচারণ হলো ইন্দোনেশিয়ার জনাব সারপিতো হাদী সিসওয়ো সাহেবের। তিনি গত মাসে ৭৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি ২১ বছর বয়সে বয়আত করেছিলেন আর এরপর খুবই অবিচলতার সাথে তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। মরহুম স্ত্রী ছাড়াও আট সন্তান স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রেখে গেছেন। তার এক পুত্র মুবাল্লেগ হিসেবে জামা'তের সেবা করছেন। মরহুম বেশ কয়েকবার জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ইন্দোনেশিয়ার দারুল কাযা বিভাগে কাজী হিসেবেও দায়িত্ব পালনের তিনি তৌফিক লাভ করেছেন। তবলীগের একান্ত আগ্রহ ছিল। একজন সক্রিয় দাঈ ইলাল্লাহ্ ছিলেন। যে কোন কঠিন পরিস্থিতিতে তার তবলীগের স্পৃহা কখনো নিঃশেষ হয়নি। তার পুত্র মুরব্বী আরওয়ান হাবীবুল্লাহ্ সাহেব বলেন, বহুবার এমন হয়েছে যে, মোটর সাইকেল কারো বাসায় রেখে তবলীগের উদ্দেশ্যে বহু কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতেন। ভিন্ন গ্রামে যাওয়ার জন্য নদনদী ও পাহাড়পর্বত পাড়ি দিতে হলেও দিতেন। সফর অনেক কষ্টকর ছিল। আমাদের পিতা অনেক পরিশ্রমী ও কষ্ট সহ্যকারী মানুষ ছিলেন। তিনি যখন শিক্ষক হিসেবে চাকরি করতেন তখন তিনি স্কুলের প্রিন্সিপালের কাছে আবেদন করেন যেন তার পাঠদানের দায়িত্ব চার দিনের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়, অর্থাৎ স্কুলে যতগুলো ক্লাস তার ছিল সেগুলো যেন চার দিনে সম্পন্ন হয়ে যায় আর বাকি দিনগুলো যেন তিনি ছুটি করতে পারেন, যাতে করে তবলীগের জন্য অধিক সময় হাতে পাওয়া যায়। বৃহস্পতিবার স্কুলের কাজ শেষে সোজা তবলীগের উদ্দেশ্যে চলে যেতেন আর রবিবার সন্ধ্যায় ঘরে ফিরতেন, বরং কখনো কখনো সোমবার সকালে ঘরে ফিরে আসতেন।

মুরব্বী সিলসিলা বাশারত আহমদ সাহেব লিখেন যে, মধ্য জাভায় ওনোসোভো অঞ্চলে দশটি জামা'ত তার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সকল অবস্থায় বিশেষভাবে তাহাজ্জুদ পড়তেন। সকল স্তরের মানুষের সাথে খুবই সম্মান ও নম্রতাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। একবার তিনি বলেন, আমার বাসনা হলো (জীবনের) শেষ দিন পর্যন্ত যেন তবলীগের কাজে ব্যস্ত থাকি। এরই মাঝে আমার আনন্দ এবং আমার স্বাস্থ্যের চাবি ছিল। মুরব্বী সিলসিলা আহমদ হেদায়েতুল্লাহ্ সাহেব বলেন, মরহুম একজন সাহসী দাঈ ইলাল্লাহ্ ছিলেন। বিরোধীদের পক্ষ থেকে হুমকি দেয়া হলে কখনো ভীত হতেন না আর খবুই দৃঢ়তার সাথে তাদের মোকাবিলা করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে মাগফিরাত ও কৃপার আচরণ করুন এবং মর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ চৌধুরী বশীর আহমদ ভাট্টি সাহেবের, যিনি নানকানা জেলার গোড়ুর আল্লাহ্ দাদ সাহেবের পুত্র ছিলেন। গত মাসে ৯৫ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার ছেলে তানজানিয়ার মুরব্বী সিলসিলা মুহাম্মদ আফযাল ভাট্টি সাহেব বলেন, তিনি জন্মগত আহমদী ছিলেন। নামায-রোযায় অভ্যস্ত, ন্যায়পরায়ণ ও স্বচ্ছভাষী ছিলেন। আহমদীয়াত এবং খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল। শিশুকাল থেকেই কাদিয়ান জলসায় যেতেন। গ্রামে তাবিযকবযকারীদেরকে মানুষ বড় ভয় পেত। এটি আমাদের দেশে সাধারণ রীতি। তিনি তাদেরকে বলতেন যে, এসব মানুষকে ভয় পেয়ো না, কেননা তারা খোদা তা'লার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু গ্রামের

লোকেরা তাকে বলত, আপনারা আহমদী। এসব জিনিস আপনারা বিশ্বাস করেন না বিধায় আপনাদের এতে কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু আমরা এগুলোকে খুব ভয় পাই। ১৯৫৩ সালে যখন দাঙ্গা-ফাসাদ আরম্ভ হয় তখন আহমদীয়াত বিরোধীরা এলাকায় মিছিল বের করে এবং আহমদীদের বাড়িঘরে আগুন লাগানোর ষড়যন্ত্র করে। পার্শ্ববর্তী গ্রামের তার কতক বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তিসম্পন্ন অ-আহমদী আত্মীয়স্বজন, লোকজন তাদের কাছে যায় আর বলে যে, তোমাদের যেসব আত্মীয়স্বজন আহমদী খামারবাড়িতে থাকে তাদেরকে বুঝিয়ে বল যেন তারা সেখান থেকে চলে যায়, কেননা আমরা আগামীকাল সেখানে আগুন লাগানোর পরিকল্পনা করেছি অথবা তারা যেন আহমদীয়াত ছেড়ে দেয়, নতুবা পরিণাম ভালো হবে না। তার আত্মীয়স্বজন যখন তাকে এটি বুঝায় যে, সাময়িকভাবে আহমদীয়াতকে অস্বীকার কর আর যখন মিছিল চলে যাবে তখন আবার নিজ ধর্মে ফিরে যেও, একথা শুনে তিনি বলেন, আপনারা দুশ্চিন্তা করবেন না। আমরা বুঝেশুনে আহমদী হয়েছি, তাই আমাদের কোন ক্ষতি হবে না। আমরা আহমদীয়াতের জন্য জীবন দিতে পারি, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও নিজের ঈমান থেকে সরে আসার কথা ভাবতে পারি না। যাহোক, তিনি বলেন, তোমরা যদি কিছু করতে না পার তবে করার প্রয়োজন নেই, আমরা আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসা করি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এমন ব্যবস্থা করেন যে, মিছিল কিছুদূর এসে আপনাআপনিই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং তারা আহমদী এলাকায় প্রবেশের সাহস পায় নি।

তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে দুই কন্যা এবং পাঁচ পুত্র রয়েছে। এক ছেলে হলেন মুরব্বী সিলসিলা মুকাররম আফযাল ভাট্টি সাহেব, যিনি তানজানিয়াতে সেবা করার তৌফিক পাচ্ছেন আর কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে জানাযা ও দাফনকাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তানদেরও তার পুণ্য ধরে রাখার তৌফিক দিন এবং তার ছেলে, যিনি (জানাযায়) অংশগ্রহণ করতে পারেন নি, তাকেও ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হামিদুল্লাহ্ খাদেম মালহি সাহেবের, যিনি রাবওয়ার পশ্চিম দারুন্ নসর নিবাসী চৌধুরী আল্লাহ্ রাখখা মালহি সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি ৮২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী চৌধুরী আল্লাহ্ বখশ গুল্লর (রা.)-এর দৌহিত্র এবং মুরব্বী সিলসিলা শহীদ নসরুল্লাহ্ মালহি সাহেবের পিতা ছিলেন। মরহুম নামায-রোযায় অভ্যস্ত, সহজ-সরল, ভদ্র, দরিদ্রদের লালনকারী, নিষ্ঠাবান ও নিবেদিতপ্রাণ আহমদী ছিলেন। চাকরিতে থাকা অবস্থায় তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে বিরোধিতার মোকাবিলা করেছেন। তার এক পুত্র ওয়াকফে যিন্দেগী হিসেবে রাবওয়ার তাহের হার্ট ইন্সটিটিউট-এ কাজ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ পেশাওয়ার নিবাসী মুহাম্মদ আলী খান সাহেবের, যিনি শরীফউল্লাহ্ খান সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি ৮৯ বছর বয়সে ঐশী তকদীর অনুযায়ী ইহধাম ত্যাগ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি এক-অষ্টমাংশের ওসীয়্যতকারী ছিলেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে ৩ কন্যা ও ৭ পুত্র সন্তান রয়েছে। তার এক কন্যা সেলিমা সাহেবা, যিনি এখানে ইসলামাবাদে বসবাসকারী বুরহান সাহেবের স্ত্রী, তিনি লিখেন, পূর্বে তাদের পরিবার গয়ের মুবায়ে (অর্থাৎ লাহোরী) ছিল, এরপর ১৯৫৪ সনে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর হাতে বয়আত করেন এবং আমৃত্যু জামা'ত ও খিলাফতের সাথে যুক্ত থাকেন আর তার পিতা ধর্মীয় আত্মাভিমান ও জামা'তের সাথে গভীর সম্পৃক্ততা প্রদর্শন করেন। তার পিতা প্রথমে লাহোরী ছিলেন, (এরপর) ১৯৫৪ সনে বয়আত করেছিলেন। যাহোক, এরপর তিনি জামা'তের কাজ করার সুযোগ লাভ করেন, খোদ্দামুল আহমদীয়ার জেলা কায়েদ ছিলেন।

এরপর সেক্রেটারী ওসীয়্যত এবং সেক্রেটারী তা'লীমুল কুরআন ইত্যাদিও ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাদি গভীর মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করতেন। পবিত্র কুরআনের প্রতি তার অপরিসীম ভালোবাসা ছিল। সর্বদা তাকে কুরআন পাঠ করতে দেখেছি। পবিত্র কুরআনের অনেক অংশ তার মুখস্থ ছিল। দোয়ায় অভ্যস্ত, পুণ্যবান, অতিথিপরায়ণ, সত্যবাদী ও অবিচল মানুষ ছিলেন। অনেক বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করতেন। মানুষকে অনেক আর্থিক সাহায্যও করতেন। তার এক অ-আহমদী আত্মীয় তাকে বলেন যে, আপনি যদি আহমদীয়াত ত্যাগ করেন তাহলে আমরা আপনার পদতলে উৎসর্গিত হতেও প্রস্তুত আছি। তিনি (অর্থাৎ মরহুমের মেয়ে) বলেন, আমার পিতা তাকে উত্তর দেন যে, তোমাদের কুরবানীর আমার কি প্রয়োজন? আমি তো নিজেই আত্মোৎসর্গ করেছি। এখন আমার কথা শোন! যার আসার কথা তিনি এসে গেছেন, (তাই) মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গ্রহণ কর এবং নিজেদের জীবনকে নিরাপদ কর। যাহোক, তারা কোন মনোযোগ দেয় নি। ধীরে ধীরে সেসব আত্মীয়-স্বজন (তার) সঙ্গ পরিত্যাগ করে, কিন্তু আহমদীয়াতের সাথে তার সম্পর্ক প্রতিনিয়ত দৃঢ় হতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন। (তার) পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো, আমেরিকার মেরিল্যাণ্ড নিবাসী সাহেবযাদা মাহদী লতীফ সাহেবের, যিনি ৮৭ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। সাহেবযাদা মাহদী লতীফ সাহেব হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব শহীদ (রা.)-এর পৌত্র আর প্রয়াত সাহেবযাদা মুহাম্মদ তৈয়্যব লতীফ সাহেবের পুত্র ছিলেন। মরহুম সাহেবযাদা মাহদী লতীফ সাহেব আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওসীয়্যত করেছিলেন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী গভীর ও ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। (তিনি) পাঁচবেলার নামায ও তাহাজ্জুদ নিয়মিত পড়তেন। আহমদীয়া খিলাফতের প্রেমে বিভোর ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী এবং নম্রস্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তার তবলীগ করার গভীর আগ্রহ ছিল। আর সর্বদা অন্যদেরও তবলীগ করার জন্য অনুপ্রাণিত করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন আর (তার) পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো, শেহযাদ আকবর সাহেবের পুত্র ফয়যান আহমদ সামীর সাহেবের। শেহযাদ আকবর সাহেব আমাদের রাবওয়াস্থ প্রাইভেট সেক্রেটারী অফিসের কর্মচারী, তিনি (অর্থাৎ ফয়যান আহমদ সামীর সাহেব) তার পুত্র ছিলেন। করোনা আক্রান্ত হয়ে মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। প্রখর মেধাবী, স্বল্পভাষী, ভদ্র স্বভাবের নেক ছেলে ছিল। ওয়াক্‌ফে নও এর তাহরীকভুক্ত ছিল। নিজের পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী আর অপ্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ড, বরং খেলাধূলাতেও খুব কমই অংশ নিত। খুবই গম্ভীর প্রকৃতির ছেলে ছিল। স্কুলের পর অধিকাংশ সময় বাড়িতেই কাটাতো। আল্লাহ্ তা'লা প্রয়াতের পিতামাতাকেও ধৈর্য দিন। প্রয়াতের নানা খাজা আব্দুশ্ শাকুর সাহেবও দীর্ঘদিন জামা'তের সেবা করেছেন। (আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি) ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন, (তার) পদমর্যাদা উন্নীত করুন।